টুকরো কথা

পারিবারিক হিংসারোধ আইন-২০০৫

পরিবার এবং সমাজে বাস করতে গিয়ে নারীদের নানা বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়। সেসবের প্রতিকারের বিধানও ভারতের সংবিধানে আছে। এমনই একটি আইন হলো পারিবারিক হিংসারোধ আইন - ২০০৫। পরিবারের কোনো মহিলা যদি কোনো ঘটনায় নিপীড়নের শিকার হন, তাহলে তিনি এই আইনে সুরক্ষা পেতে পারেন।

এই আইন মোতাবেক মেয়েরা অত্যাচারিত হলে সে বিষয়ে মুখ্য বিচার বিভাগীয়

বিচারকের কাছে আবেদন জানাতে পারেন। এছাড়া প্রতিটি জেলার সুরক্ষা আধিকারিক (Protection Officer)-এর কাছেও এ ব্যাপারে আবেদন করা যায়। সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে আইনি সাহায্য পাওয়া যায়। পারিবারিক হিংসারোধ আইনের আওতায় অন্যান্য কতকগুলি বিষয় রয়েছে। যেমন, মানসিক পীড়ন ও অর্থনৈতিক পীড়ন ইত্যাদি। তবে শুধু আইন প্রণয়ন করেই এধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই সমাজে সার্বিক শিক্ষার বিকাশ ও নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে ফলপ্রসূ করা প্রয়োজন।

অনগ্রসর নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ভূমিকা

ভারতের জনসমাজের একটা বড়ো অংশ ঔপনিবেশিক আমলে 'পশ্চাদপদ শ্রেণি' বলে পরিচিত হতেন। মূলত সামাজিকভাবে 'অস্পৃশ্য' মানুষেরাই ঐ পরিচয়ের মধ্যে পড়তেন। তাছাড়া তাঁদের 'তফশিলি জাতি', 'হরিজন' ও 'দলিত' প্রভৃতি বলেও উল্লেখ করা হতো। বস্তুত এই সমস্ত শব্দগুলি দিয়ে ভারতীয় সমাজে ঐ সব মানুষের সামাজিক অবস্থান বোঝানো হতো। ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতের দলিত-সমাজ নিজেদের অধিকারের প্রসঙ্গে সচেতন হতে থাকেন।

মনে রেখো

প্রতিটি শিশু, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে জন্মায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ে শিশুরা নানা অত্যাচারের শিকার হয়। শিশুদের অধিকার রক্ষার কথাও সংবিধানে আছে।

সামাজিক অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ প্রথম নিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ প্রস্তাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে স্বরাজ অর্জনের জরুরি শর্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি। যদিও অসহযোগ আন্দোলন মিটে যাওয়ার পরে গান্ধির অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কর্মসূচিতে

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূল রূপকার বি. আর. আম্বেদকর।

কারোরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। গান্ধি মূলত হিন্দু মন্দিরে হরিজনদের ঢুকতে পারার অধিকার নিয়েই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ধর্মীয় অধিকার পেলেও, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে হরিজনরা বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলেন। তাই সামাজিকভাবেও হরিজনদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে গান্ধির কর্মসূচির সঙ্গে বি. আর. আম্বেদকরের মতামতের পার্থক্য হয়েছিল। আম্বেদকর চেয়েছিলেন শিক্ষা, চাকরি

ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও দলিতদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে। ক্রমেই দলিতদের আলাদা রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে দেখার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন আম্বেদকর দাবি করেন দলিত সমাজের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য তাদের আলাদা নির্বাচনের অধিকার দিতে হবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি আম্বেদকরের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দলিত মানুষদের তফশিলি জাতি হিসাবে আলাদা নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। তার প্রতিবাদে গান্ধি আমরণ অনশন শুরু করেন। ফলে বাধ্য হয়ে আম্বেদকর গান্ধিকে অনশন তুলে নিতে অনুরোধ করেন। গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে একটি চুক্তি

(পুনা চুক্তি) হয়। সেই চুক্তি অনুসারে দলিতদের আলাদা নির্বাচনের বদলে যৌথ নির্বাচনেই তফশিলি জাতির জন্য ১৫১টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু দ্রুতই দেখা যায় হরিজন বিষয়ে গান্ধির কর্মসূচিতে কংগ্রেসি নেতৃত্বের বিশেষ উৎসাহ নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই জাত পাতের বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন কংগ্রেসের অনেক নেতা। ফলে নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলিত-সমাজের আন্দোলন চলতেই থাকে। কিন্তু, তফশিলি সম্প্রদায়গুলি নিজেদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ

সফল হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতার হস্তান্তরের ফলে তফশিলি সম্প্রদায়ের আন্দোলন এগোতে পারেনি।

অন্যদিকে, কংগ্রেসও ক্রমে তফশিলি সম্প্রদায়ের দাবিগুলির প্রতি আপাতভাবে সহমর্মী অবস্থান নিয়েছিল। সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আম্বেদকরের নির্বাচন তারই প্রমাণ। আম্বেদকরের উদ্যোগেই স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর নাগরিকদের উন্নয়নের জন্য নীতি তৈরি করা হয়।

ভারতের সংবিধানে অবশ্য তফশিলি জাতি ও উপজাতির কোনো সংজ্ঞা দেওয়া নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে তফশিলি জাতি ও উপজাতির একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। ঐ তালিকা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে রাষ্ট্রপতির তরফে বিভিন্ন রাজ্যের তফশিলি জাতি ও উপজাতির একটি তালিকা তৈরি করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেই মর্মে একটি আইনও বলবৎ করা হয়েছে। সেই তালিকায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকেও রাখা হয়েছে। তাঁদের জন্য যথাযথ অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইঙ্গ-ভারতীয় শ্রেণিকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

কিন্তু 'অনগ্রসর' জাতি ও উপজাতি বলতে ঠিক কাদের বোঝায়, সে ব্যাপারেও সংবিধানে নির্দিষ্ট

সংজ্ঞা দেওয়া নেই। পরবর্তীকালে অনগ্রসরতার কয়েকটি মাপকাঠি সরকারের তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়। যেমন—

- ❒ হিন্দু সমাজের বিধান অনুযায়ী যাঁরা সমাজের নীচুস্তরে অবস্থান করেন;
- ❒ যাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন কম;
- ❒ যাঁদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সরকারি চাকরি পেয়েছেন এবং
- ❒ যাঁদের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারও কম, তাঁরাই হলেন অনগ্রসর জাতি ও উপজাতি।

ভারতীয় সংবিধানে ‘সংখ্যালঘু’ বলতে সমাজে সংখ্যার ভিত্তিতেই সংখ্যালঘু বোঝানো হয়েছে। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুর ধারণা ব্যবহার হয়নি। সংবিধানগতভাবে সরকার সংখ্যালঘু

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষা করতে দায়বদ্ধ। ভারতীয় সংবিধান দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। পাশাপাশি ধর্মীয় সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

ভারতের সমস্ত মানুষকে তাঁর নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র কিংবা সরকার কোনোভাবেই কোনো সংখ্যালঘু সংস্কৃতির উপর, সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি বা আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে পারে না। এ ব্যাপারে সরকার কোনো আইনও বলবৎ করতে পারে না। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধান ভাষার দিক থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের

অধিকারও সুরক্ষিত করেছে। যেমন, সাঁওতাল জনগণের অলচিকি লিপিকে ভারতের সংবিধানে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্তরে তাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে সংবিধান। সরকারি ও সরকারি-অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক সুযোগ পাবেন। সরকারি অনুদান ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমস্ত রকম বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। তফশিলি জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন অনগ্রসর নাগরিকের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সমস্ত নাগরিককে সমান মর্যাদা দেওয়া ভারতের

সংবিধানের উদ্দেশ্য। সমস্ত নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংবিধান বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি জীবন-জীবিকা ও শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে ভারতের সংবিধান মানবিক দায়বদ্ধতার নজির রেখেছে।

সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ

ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের ছয়টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেই মৌলিক অধিকারগুলি হলো : **সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার,**

শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। এই অধিকারগুলি শাসন ও আইন বিভাগে কর্তৃত্বের বাইরে রয়েছে। তাই সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে ভারতের যে কোনো নাগরিক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

অধিকার লাভের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক কর্তব্যসমূহ

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হবে —

- সংবিধান, সংবিধানের আদর্শ, বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় স্তোত্রের প্রতি সম্মান দেখানো।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ আদর্শগুলির সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও রক্ষা করা।
- ভারতের প্রতিরক্ষায় অংশ নেওয়া এবং জাতীয় সেবামূলক কাজের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাতে যোগ দেওয়া।

- ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত বিভিন্নতার ঊর্ধ্বে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং নারীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ত্যাগ করা।
- ভারতের সমন্বয়বাদী, মিশ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সম্মান ও রক্ষা করা।
- ভারতের বন্যপ্রাণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করা।
- প্রত্যেক নাগরিকের তরফে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের মানসিকতাকে গ্রহণ করা ও তার দ্বারা চালিত হওয়া।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা ত্যাগ করা।

- ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বিক জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে চলা।
- বাবা-মা অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকার কর্তব্য হলো তাঁদের ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়স্ক সন্তান বা পোষ্যের শিক্ষার যথোচিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা (এটি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনে যুক্ত হয়েছে)।

‘‘অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ–উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।’’

সকলের জন্য অন্ন- বস্ত্র- বাসস্থান ও শিক্ষা। মূল ছবিটির শিরোনাম বিশ্বশান্তি, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য- র আঁকা।

ভেবে দেখো
খুঁজে দেখো

১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :

ক) ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক

খ) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল

গ) পৌরসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা

ঘ) ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল নেহরু, বি. আর. আম্বেদকর

ঙ) ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি, ২৬ নভেম্বর, ২০ মার্চ (স্বাধীন ভারতের নিরিখে)।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) সংবিধান হলো বিচার বিভাগের আইন সংকলন।

খ) ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রূপকার বি. আর. আম্বেদকর।

গ) ভারতে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসক।

ঘ) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঙ) পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ টি শব্দ) :

ক) স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় ভারতের সংবিধান রচনার তাগিদ দেখা দিয়েছিল কেন?

খ) ভারতের সংবিধানে গণতান্ত্রিক শব্দটির তাৎপর্য কী?

গ) ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়েছে কেন?

ঘ) মহাত্মা গান্ধি দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

ঙ) ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের কী কী মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি ব্যাখ্যা করো। প্রস্তাবনায় বর্ণিত সাধারণতন্ত্র শব্দটি কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

খ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম বিষয়ে আলোচনা করো। যথাক্রমে রাষ্ট্র ও রাজ্যের পরিচালনায় এঁদের ভূমিকা কী?

গ) পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মাধমে কীভাবে গণতন্ত্রের ধারণা বিস্তৃত হয়? তোমার স্থানীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে আলোচনা করো।

ঘ) ভারতের সংবিধান নারীদের অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত করেছে? নারীদের সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতোটা জরুরি বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দিয়ে লেখো।

ঙ) তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর নাগরিকদের উন্নয়নে সংবিধান কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) তোমার স্থানীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা তোমায় গ্রাম পঞ্চায়তে বা পৌরসভায় নির্বাচন করে পাঠালেন। তোমার এলাকার উন্নতির জন্য তুমি কী কী ব্যবস্থা নেবে?

খ) ধরো তুমি একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা। তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কী কী কর্মসূচির মাধ্যমে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি তোমারা সবাই মিলে পালন করবে? কর্মসূচিগুলির একটি খসড়া তৈরি করো।

ভারত–ইতিহাসের সালতামামি খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত

১৭০৭ মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।

১৭১৭ মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার ব্রিটিশ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকাব দেন।

১৭৪৪-'৪৮ প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ।

১৭৫০-'৫৪ দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ।

১৭৫৬-'৬৩ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ভারতে তৃতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ

১৭৬০ বন্দিবাসের যুদ্ধ—ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান।

১৭৫৬ বাংলার নবাব সিরাজ উদ-দৌলা কর্তৃক ইংরেজদের কাছ থেকে কলকাতা অধিকার।

১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধ।

১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধ।

১৭৬৫ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার দেন।

১৭৬৭-'৬৯ প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৭২ গভর্নর হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংসের নিয়োগ।

১৭৭৩ রেগুলেটিং অ্যাক্ট।

১৭৭৪ ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের গভর্নর জেনারেল হন। কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট (ইম্পিরিয়াল কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৭৫-'৮২ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

১৭৮০ হিকি-এর বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হয়।

১৭৮০-'৮৪ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৮৪ পিট-এর ইন্ডিয়া অ্যাক্ট।

১৭৮৬ লর্ড কর্নওয়ালিস নতুন গভর্নর জেনারেল হন।

১৭৯০-'৯২ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৯৩ বাংলায় রাজস্ব আদায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন।

১৭৯৮ লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হন।

১৭৯৯ চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৮০৩-'০৫ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

১৮১৭ কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮১৭-'১৯ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

১৮১৮ বাংলা ভাষায় সংবাদপত্ররূপে সমাচার দর্পণ ও দিগদর্শন প্রকাশিত হয়।

১৮২৮ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক গভর্নর জেনারেল হন।

১৮২৯ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

১৮৩৩ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিলোপ।

১৮৩৫ লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত দলিল।

১৮৪৫-'৪৬ প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ।

১৮৪৮ লর্ড ডালহৌসি গভর্নর জেনারেল হন।

১৮৫৩ বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু।

১৮৫৬ কোম্পানির তরফে অযোধ্যা অধিগ্রহণ। বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন করা হয়।

১৮৫৭-'৫৮ সেনাবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহ।

১৮৫৮ ভারতে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনের সূচনা।

১৮৫৯-'৬০ বাংলায় নীল বিদ্রোহ।

১৮৭৬ ভারতসভার প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬-'৭৭ দিল্লি দরবার --- ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষিত।

১৮৭৮	‘রাজদ্রোহী’ দেশীয় সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রণয়ন।
১৮৮৩	ইলবার্ট বিল বিতর্ক।
১৮৮৫	ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৯	লর্ড কার্জন ভাইসরয় হন।
১৯০৫	বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন।
১৯০৬	সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা।
১৯০৭	জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন ও নরমপন্থী-চরমপন্থী বিচ্ছেদ।
১৯০৯	মর্লে-মিন্টো সংস্কারবিধি।
১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৯১২	ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত।

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু।

১৯১৫ গান্ধি ভারতে ফিরে আসেন।

১৯১৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে লখনৌ চুক্তি। হোমরুল লিগ গঠন।

১৯১৯ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিধি। গান্ধির নেতৃত্বে রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

১৯২১ গান্ধির নেতৃত্বে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২২ চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার।

১৯২৩ স্বরাজ্য দলের প্রার্থীদের আইনসভায় প্রবেশ।

১৯২৮ সাইমন কমিশনের ভারত সফর। কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভ। সর্বদলীয় সম্মেলন। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের বিষয়ে মোতিলাল নেহরুর প্রতিবেদন।

১৯২৯	লাহোর কংগ্রেস ও পূর্ণ স্বরাজের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তাব।
১৯৩০	গান্ধির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন। লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আলোচনা।
১৯৩১	গান্ধি-আরউইন চুক্তি। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধির অংশগ্রহণ এবং বৈঠক ব্যর্থ। ভগৎ সিং, সুখদেও ও রাজগুরুর ফাঁসি।
১৯৩২	কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষণা। দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং পুনা চুক্তি। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ।
১৯৩৪	আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি।
১৯৩৫	ভারত শাসন আইন।

১৯৩৭	আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন।
১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশন।
১৯৪০	লর্ড লিনলিথগোর ডোমিনিয়ন স্টেটাস বিষয়ক আগস্ট প্রস্তাব। মুসলিম লিগ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯৪২	ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা। ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
১৯৪৪	গান্ধি-জিন্নাহ্ আলাপ-আলোচনা।
১৯৪৫	আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের বিচার — সর্বত্র প্রতিবাদ।
১৯৪৬	রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ। ভারতে মন্ত্রী মিশন। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার।

১৯৪৭	১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ক্লিমেন্ট এটলির ঘোষণা। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। পাকিস্তান ও ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর। সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং গণ অভিপ্রয়াণ।
১৯৪৯	স্বাধীন ভারতের একটি নতুন সংবিধান গৃহীত ও স্বাক্ষরিত (২৬ নভেম্বর)।
১৯৫০	নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠে ভারত (২৬ জানুয়ারি)।

[এই সালতামামি সম্পূর্ণ নয়। কেবল এই বইতে আলোচ্য প্রসঙ্গসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সালতারিখ এখানে দেওয়া হলো।]

****

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির জন্য অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বই *অতীত ও ঐতিহ্য* ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো। এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে।
- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫)-র নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক যুগের ইতিহাসের (অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে আনুমানিক বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫৫(সূর্যাস্ত আইন), ৫৮, ৬৩, ৮১, ৮২, ৮৬, ৯১, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১১, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৮, ১৩২, ১৩৭, ১৪২ ও ১৪৮ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- এই বইটির ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ছবি নয়। ছবিকে সব সময়েই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি মূল পাঠ্যবিষয়বস্তুরই অঙ্গ। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি পর্যায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাল-তারিখ। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- অনেক পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। পাঠ্যবিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে/শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের মানচিত্র, চার্ট ও তালিকা, মডেল, ছবি সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগ্রহ/বিবরণ প্রদর্শনে উৎসাহিত করা যেতে পারে। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা করা যেতে পারে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও অভিনব তথা সৃজনশীল প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে **নিজে করো** শীর্ষক এবং অধ্যায়ের শেষে **ভেবে দেখো খুঁজে দেখো**-র অন্তর্গত **কল্পনা করে লেখো** শীর্ষক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী '**ভেবে দেখো খুঁজে দেখো**' দেওয়া আছে, তার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে।
- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না।** ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।

আমার পাতা

আমার পাতা